বিশ্বভারতী : রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বসাধনা

মো. জফির উদ্দিন*

[সারসংক্ষেপ : আমৃত্যু রবীন্দ্র জীবনসাধনা ছিল মনুষ্যত্বেরই সাধনা। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায়। কিন্তু নোবেলবিজয়ী কবি বিশ্বপরিভ্রমণ করে এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মনুষ্যত্বের পরাজয় দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ভেবেছিলেন বিশ্বসভ্যতায় ভারতেরও দেওয়ার কিছু আছে। ক্রমবর্ধমান ঔপনিবেশিক শিক্ষাপরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বা বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজসমূহে 'বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালিতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে', কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদলে পাশ্চাত্যবিদ্যার সংযোগে জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে 'তপোভূমি' রচনার দরকার। একইসঙ্গে দরকার ব্যাপকভাবে সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠারও। তখনকার ভারতে সাধনা বলতে সাধারণত আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা বা সন্ন্যাসের সাধনাই বুঝানো হতো, কিন্তু রবীন্দ্র-আশ্রম উদ্যোগে সাধারণ মানুষের 'চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে' কোনো লক্ষ্য ছিল না। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে-সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, তার বাইরে গিয়ে সবরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লিহিতসাধনের জন্য যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তকেই তিনি সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বিদ্যার উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক মানের স্বপ্ন নিয়ে দেশের 'সত্য বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার সংকল্পে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ বিদ্যালয়ের নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বভারতী'। চল্লিশ বছরের কর্মসাধনায় 'বিশ্বভারতী'কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্বসভায়, যার মূলমন্ত্র ছিল মনুষ্যত্বের সাধনা। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই সংকলন-গ্রন্থ 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে। 'বিশ্বভারতী : রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বসাধনা' প্রবন্ধে বিশ্বভারতীর বক্তৃতামালার আলোকে রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ব-ধারণা ও মনুষ্যত্বসাধন অনুসন্ধান করা হয়েছে।]

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার 'বৃহৎ রচনারই অঙ্গ'। শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাবিধির নবরূপায়ণ বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাশাস্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমরস্থান যে-সুনির্দিষ্ট সে বিষয়ে মতভেদ নেই (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ১২)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবিপুরুষ, স্বাভাবিকভাবেই সে-পরিচয়ে তিনি ছিলেন একক ও নিঃসঙ্গ। তবে, পরিবর্তমান সময় ও বিশ্বপরিস্থিতিতে কবি যখন কর্মব্রতী হলেন, 'যেখানে তিনি কর্ম সৃষ্টি করেছেন, সেখানে বহুমানবের অভ্যুদয় হয়েছে'। আর পৃথিবীর ইতিহাসে 'কোনো কবি কোনো কালে বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজের অর্থ, সময়, সামর্থ্য ঢেলে দেন নি' (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ১২)। কবিপুরুষের এমনতর উদ্যোগ ও কর্মপন্থার পেছনে যে 'সত্যসংকল্প' ছিল তা হচ্ছে কবির চির-আরাধ্য 'মনুষ্যত্বসাধনা'। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায়। সে-উপায় সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিশিষ্ট বিদ্যায়তনের। সে-বিশিষ্ট বিদ্যায়তনটি রবীন্দ্রনাথ তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন ভারত-ঐশ্বর্য ও বিশ্বসম্পদের সমবায়ে দীর্ঘ ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে। তিনি এর নামকরণ করেছিলেন 'বিশ্বভারতী'।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত ২০ বছরের অধিককাল শান্তিনিকেতন-আশ্রম বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গায় অনেক বক্তৃতা করেছিলেন। শুধু তাই নয় শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে আশ্রমের আদর্শ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হতে আশ্রমগুরু জীবনের বিভিন্ন পর্বে অসংখ্য চিঠিপত্রও লিখেছিলেন। এসব বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শের সঙ্গে কর্ম ও সত্যসাধনার পাশাপাশি মনুষ্যত্বসাধনারও অবতারণা করেছেন। অন্যদিকে আমৃত্যু রবীন্দ্র জীবনসাধনা ছিল মনুষ্যত্বেরই সাধনা। সুতরাং এসব রচনায় রবীন্দ্র-মনুষ্যত্ববোধ ও মনুষ্যত্বধারণা একদিকে যেমন বিশিষ্টরূপে ধরা পড়েছে, অন্যদিকে বৈশ্বিক ও সর্বমানবিক পটভূমিকায় মনুষ্যত্বসাধনকল্পও অভিব্যক্ত হয়েছে। শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শের বিষয়ে ব্যক্তিগত পত্রাদি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বাংলা রচনাও রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, প্রাক্তণী, প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমান আলোচনাটি শুধুমাত্র *বিশ্বভারতী* সংকলনভুক্ত বক্তৃতামালা অবলম্বন করেই।

বিশ্বভারতী (১৯৫১)

১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কুড়ি বছর পরে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই সংকলন-গ্রন্থ *বিশ্বভারতী* নামে প্রকাশিত হয় ৭ই পৌষ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে (১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ) শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ের সকল বক্তৃতা সংকলিত হয়নি; বিভিন্ন সাময়িকপত্র হতে গ্রন্থে অধিকাংশ বক্তৃতাই সংকলিত হয়েছিল, যা পূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। এ-গ্রন্থে সর্বমোট ১৯টি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। বক্তৃতাগুলো ছাড়াও রয়েছে পরিশিষ্ট অংশ। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনটি হচ্ছে বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসবের সভাপতি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিল বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে বৃহৎ পৃথিবীর পরিসরে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা কাজ করে। সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ এবং ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় এর কার্যের সূচনা হয় (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৭০-৭১)। যদিও ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদ গঠন ও বিশ্বভারতীর জন্য প্রণীত সংস্থিতি (Constitution) গৃহীত হয় বলে এটিই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাদিবস বলে স্বীকৃত। এই প্রতিষ্ঠাদিবসের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যা গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

*বিশ্বভারতী*তে সংকলিত বক্তৃতামালার প্রধান বিষয় শিক্ষার আদর্শ, সমকালীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, বিশ্বভারতীর অভিপ্রায় ও আদর্শ ইত্যাদি হলেও কর্ম ও সত্যসাধনার অবতারণা করে রবীন্দ্রনাথ এসবের মধ্যেই মনুষ্যত্বসাধনার রূপকল্প হাজির করেছেন। যে-মনুষ্যত্বসাধনা রবীন্দ্রনাথের সকল সৃষ্টি ও কর্মের মূলমন্ত্র ছিল।

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের মূলে ছিল সত্য, কর্ম ও মনুষ্যত্বসাধন। এর মূল প্রেরণা ছিল মানবহিতৈষণা, দয়া, সম্মিলন ও বিশ্ববোধ। নিশ্চিতভাবেই তা সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিল। বিশ্বভারতীকে উদ্দেশ্য করে তার মূল লক্ষ্য ছিল 'সত্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা। এই সত্য বিদ্যালয় একদিকে যেমন ভারতের, অন্যদিকে তেমনি সারা পৃথিবীরও। রবীন্দ্রনাথের এরূপ শিক্ষাদর্শ বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল সমকালীন ভারতের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীত প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। অথচ ভারতের আধুনিক শিক্ষায় ভারতকে রাখা হয়েছে দূরে : 'এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৬)। অন্যদিকে সকল বড়ো দেশেই শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যাবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য, মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন এবং সে-লক্ষ্যেই সে-সব দেশে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি হয়েছে; কিন্তু 'আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজর-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫)। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় নকল করে গড়ে উঠেছে বলে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে 'ভদ্রসমাজে' প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আধুনিক শিক্ষার যোগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়,

> অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিক্‌বর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্রশিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯–১০)

এই যুক্ততার জন্যই বিশ্বভারতীর উদ্যোগ ও আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা সে-লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। অথচ আধুনিক ভারত-শিক্ষায় এখানকার জীবনের বড়ো লক্ষ্য জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, জীবিকা উপার্জনের স্থির লক্ষ্যটি ছাড়া। জীবিকার লক্ষ্য আবার শুধুমাত্র অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়েই। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে; পরিপূর্ণতাই জীবনের মহিমা– প্রয়োজন এখানে তুচ্ছ জিনিস। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে,

> এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে বা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি তাহলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।
>
> এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে

> শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই জন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৩-১৪)

কিন্তু ঔপনিবেশিক পদ-পদবিগ্রাহী শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে জীবনের মহিমা-অর্জনসুলভ শিক্ষাদর্শের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না নিশ্চয়। একদিকে অভাবের সঙ্গে অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই চলমান সরকারি বিদ্যাশিক্ষা মানুষ বহন করে চলেছে, অন্যদিকে এরূপ ভয়ংকর জবরদস্তি আছে বলেই শিক্ষাব্যবস্থায় স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না। আবার যা কিছু সমস্তই বাইরে থেকে নিতে হচ্ছে বলে 'নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৭০-৭১)। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, মানুষের মনে একটা নিঃস্ব-ভাবও তৈরি করে। শুধু তাই নয়, এধরনের শিক্ষা যে কোনও জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপকে ভেঙে দেওয়ার মতো, অথবা তার নিজের অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেওয়ার মতো এবং এতে যে সমস্ত জগতেরই ক্ষতিসাধন করা হয় তাও অনুভব করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৭)।

ভারতের একটা সমৃদ্ধ অতীত ছিল– জ্ঞানে-মানে-ধনে ও দর্শনে। রবীন্দ্রনাথ ভালো করে জানতেন, ভারতবর্ষ নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শক্তি দিয়ে জগৎকে গভীরভাবে চিন্তা করেছে এবং আপন বুদ্ধিতে তার সমাধানও করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৭)। ভারতবর্ষ এই মনন অর্জন করেছিল নিজের শক্তি দিয়ে কেননা রবীন্দ্রনাথের মতে, 'তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল', আর এখন এই যে 'ভিক্ষাবৃত্তি', 'আন্তরিক দীনতা' ও 'হীনতা' কারণ– 'এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮)। এই বিচ্ছিন্নতাকে তিনি তুলনা করেছেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদের সঙ্গে, যে-বিচ্ছেদ সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮)। অতএব তাঁর অভিমত, ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই নানা ধারা দিয়ে ভারতবর্ষের মন কেমন করে প্রবাহিত হয়েছে তাও জানতে হবে,

> এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেইরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮)

অন্যদিকে তিনি মনে করেছেন, মনের দাসত্ব ঘোচাতে চাইলে শিক্ষার দাসভাবটা ঘোচাতে হবে। সে-জন্যে তিনি আশ্রমের শিক্ষাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতকে চূড়ান্ত মেনে নিয়েছিলেন যে, ভারতের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবল সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। ফলে সেখানকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দেশীয় শিক্ষাকে মূল আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন

করে তার ওপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। তবেই সে-জ্ঞানসাধনা সত্য ও কর্ম সাধনায় পরিণত হবে– ভারতেবর্ষের মানুষ অর্জন করবে মনুষ্যত্বসাধনার বহুবিধ উপায় ও পথ। অতএব দেখা যাবে, সে-লক্ষ্যেই স্বদেশের পণ্ডিতদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে বিশ্বমনীষীদের আহ্বান করেছিলেন যারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টিকার্যে নিবিষ্ট ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ববোধ, মনুষ্যত্বধারণা ও মনুষ্যত্বসাধনা

রবীন্দ্রনাথের 'মনুষ্যত্ব' ধারণা সুবিশাল ও সুগভীর। জ্ঞানতপস্যা, কর্মযোগ ও সত্যপন্থা তাঁকে এ-ধারণায় উপনীত করেছিল। মানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মমহিমাকেই রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্ব বলে জানতেন। সৃষ্টি ও কর্মে গোটা জীবনই তিনি তাই মনুষ্যত্বসাধনা করে গেছেন এবং মানুষকে আপনার পথে অগ্রসর হতে বারবার নির্দেশও করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের অস্থির পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সকরুণ কণ্ঠে তাই উচ্চারণও করেছেন,

> আজকার দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরচয় হচ্ছে– সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি ব'লেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না– সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮১-৮২)

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়সংবেদী ও ঋষিতুল্য এই বাণী দেন ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে, যখন তার বয়স ৬২ বছর। ততদিনে কবি রবীন্দ্রনাথ কর্মী রবীন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছেন। ভাবুক ও কবি নিজেকে পল্লিবাংলার নৈসর্গিক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে কলকাতার বৃহৎজীবনের পরিসরে বৃহৎ পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে আসীন করেছেন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে। একটা সত্যসংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কবির এই সত্যসংকল্প ছিল মনুষ্যত্বসাধন-সংকল্প। কিন্তু তারও অনেক আগে বিভিন্ন রচনায় মনুষ্যত্ববোধ, মনুষ্যত্বের দায় ও মনুষ্যত্বেসাধনের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। সে-উচ্চারণের সঙ্গে বিশ্বভারতীর বক্তৃতামালার উচ্চারণে কোনো তফাত ছিল না, সে-সত্যবচনের মূল সুর ছিল একই তারে বাঁধা।

মানবদেহ নশ্বর ও মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী, তা হলেও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত জীবন, অনন্ত সম্ভাবনা। মনুষ্যত্বসাধনের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি জগৎসংসার প্রতিক্ষণেই তার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা মানুষকে একটি কথাই বলছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো, এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৫৭-৫৮)। নিখিল জগৎ মানুষকে মানব হওয়ার পথে আহ্বান করলেও তাতে বাধা সীমাহীন। নদীপথের বাধার মতো রবীন্দ্রনাথের মতে নদীর তটদ্বয়ের

ধারাবাহিক বৈচিত্র্য ও সাগরপানে অবিরাম যাত্রার মতো 'মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৫৮)। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আঘাত আছে, ভাঙন আছে, সংঘর্ষ আছে, বিচ্ছেদ আছে, যন্ত্রণা আছে; আছে দুঃখও। এই দুঃখই মানুষকে বড়ো করে, মানুষকে আপন বড়োত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করে তোলে এবং এই বড়োত্বই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে তোলে। 'বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান, অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৫৮)। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না— যদি তাহা সুলভই হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার আত্মপরিচয়।...
>
> এইজন্য পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব সহজ নহে।...
>
> কারণ, মানুষ মহৎ; কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৫৮—৫৯)

সংসারে আঘাত, সংগ্রাম আর নিরন্তর দুঃখ আছে বলেই মনুষ্যত্ব সুকঠিন; ফলে দরকার পড়ে সাধনার। ভোগ-সুখ-আরাম-বিলাসের মধ্যে আত্মার জড়ত্ব আসে; সে-জড়ত্বকে কাটিয়ে তুলতে প্রয়োজন পড়ে সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ; আর এটার জন্য মানুষকে হতে হয় বদ্ধ পরিকর।

রবীন্দ্র-মনুষ্যত্বধারণায় সত্য ও বিশ্ববোধ এবং সমগ্র বা সামষ্টিকচেতনা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ধর্মটাই এমন, তার সফলতা নির্ভর করে অন্যকে সহযোগিতার ওপর। মানুষ বুঝতে পারে, অনেকের মধ্যে সে একজন; জানতে পারে, নিজের জানাটা বিশ্বমানবমন দ্বারা যাচাই করে প্রমাণিত হলে তবে এর মূল্য। মানুষ দেখতে পায়, জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে সকলের সঙ্গে যতই সে যুক্ত হয়, ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। সুতরাং মানুষের সেই প্রকাশ শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২১)। রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে, 'এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২১)। ইতিহাসবিচারে কবি লক্ষ্য করেছেন, মানুষের এই আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছেছে বিশ্বমানসলোকে— যেখানে তার সৌন্দর্য ও মুক্তি। 'সত্যতপস্যা' ও 'জ্ঞানযজ্ঞ'ই মানবের রুদ্ধমনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্‌বোধন করে। রবীন্দ্রনাথের ঘোষণা, 'এই তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের

আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সে জানে সত্যকে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২১)। প্রকারান্তরে এই সত্যসাধনাই মনুষ্যত্বসাধনা।

জীবভাব ও বিশ্বভাব– এই দুইপ্রকার ভাব নিয়েই মানুষ বাঁচে। আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে ও আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে জীবে অবস্থান ও চলা। মানুষের মধ্যে সে-জীবত্ব পেরিয়ে যে-সত্তা তা-ই তার আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২১)। আর এই নির্দেশনা বিচ্ছিন্নতা, অপূর্ণতা বা ব্যক্তিগত সীমার দিকে নয়– বরং বিশ্বমানবের দিকে। এ থেকে বিচ্যুত হলেই সে-আদর্শচ্যুত হয়, মানবত্ব খর্ব হয়; মনুষ্যত্বের পতন ঘটে : 'যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২২)। কিন্তু মানুষকে সেই মানবসত্য রক্ষা করতেই হবে, সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এই প্রেরণায় যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। এই প্রেরণা বিশ্বমানবের প্রেরণা, –আর তাতে প্রবৃত্ত হতে হবে আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য, সমাজরক্ষার খাতিরে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। মানুষ তার আপন অন্তরের গভীরতর প্রচেষ্টায়ই তার সাধন করতে হবে। রবীন্দ্রদর্শনে 'এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২৫)। আর তাঁর মতে, এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, ভব্যতা, রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মকে। কেননা,

> জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল যে-সব দেশবাসী অতীতকালের, তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে কিন্তু আবদ্ধ হয়নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাদেরই রচনা। তাঁদের স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান; বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি তার সৃষ্টি তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবী কালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিধর্ম-নির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২৫)।

সাধক-কর্মী সে-পুরুষেরা তাই প্রমাণ করেন সকল মানুষকে নিয়ে, সকল মানুষকে অতিক্রম করে, কালের সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র 'এক-মানুষ' বিরাজিত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সেই মানুষকে প্রকাশ করতে হবে বলে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলে মানুষের বাস সুতরাং দেশে দেশে : 'অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে– যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২৫)। অন্যদিকে, মানুষের অপূর্ণতার উপলব্ধি এবং পূর্ণতার আদর্শ জ্ঞান, সত্য, প্রেম ও কর্মে চালিত করে তাকে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই উপলব্ধি

ও আদর্শ মনুষ্যত্বেরই দায়। এই দায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণী হচ্ছে : 'মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২৭)। এই অন্তহীন সাধনাই, রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বের সাধনা।

বিশ্বভারতী : মনুষ্যত্বসাধনা

বিশ্বভারতীর পরিচয় একটি বিদ্যাপীঠ হিসেবেই। জীবনের সুগভীর আদর্শ বিতরণ ও প্রতিষ্ঠা এর মূল লক্ষ্য হলেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রয়োজন বা জীবিকাকে মোটেও অবজ্ঞা করেননি। বরং তিনি লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে জীবিকাকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে চেয়েছেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রায় ১১ বছর পর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাবহারিক জীবন ও বিষয়বুদ্ধির ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে, মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেখানে আপন ব্যক্তিগত জীবননির্বাহে তার জ্ঞান, কর্ম ও সৃজনশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। কিন্তু মানুষের আরও একটা দিক আছে যা ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সে জীবনে মানুষ বাঁচতে চায় (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬১৯)। রবীন্দ্রনাথের জবানিতে,

> স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।
>
> কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬১৯)

সুতরাং জৈবপ্রয়োজনের বাইরে মনুষ্যত্বের বিকাশ যে-মানবধর্ম তার সাধনক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বভারতীতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই শান্তিনিকেতনে 'সর্বমানবের যোগ-সাধনের সেতু'-রচনার কল্পনা তাঁর মনকে ক্রমশ অধিকার করতে থাকে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত একখানা পত্রে। কবি তখন আমেরিকার শিকাগো থেকে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখেন,

> ... এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাই নে। ... মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার হয়েছে, এখন সময় হয়েছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগমুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না?...মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখিদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোয় ফুটে উঠবে না? (রবীন্দ্রনাথ, ১৩২০)

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে উগ্র জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের আদর্শ গোটা বিশ্বকে রণক্ষেত্রে পরিণত করলে মানুষের জীবনে যে সর্বনাশ সংসাধিত হয় তাতে পৃথিবীর অন্য ভাবুকদের মতো রবীন্দ্রনাথও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি একদিন বলেছিলেন যে, মানুষের মিলনতপস্যাকে ভঙ্গ করার জন্য শয়তান জাতীয়তাবোধকে অবলম্বন করে কী বিরোধ কী আঘাত, কী ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। মানুষের সে অপকর্ম থেকে আত্মাকে রক্ষার জন্য কবির বাণী ছিল, 'শান্তিনিকেতনে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ,

জাতিভেদ, ভুলব। আমাদের দেশে চারিদিকে ধর্মের নামে অধর্ম চলচে, মানুষকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে– আমরা আশ্রমে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব' (রবীন্দ্রনাথ, উদ্ধৃত– প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ৯৮)। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের মে হতে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। জাপানে গিয়ে ন্যাশনালিজমের উগ্র রূপ দেখে তাঁর মন পীড়িত হলো। শিক্ষানীতিতে জাপান যেভাবে 'ন্যাশনালিজমের বিষ' শিশুমনে রোপণ করতে তৎপর হয়েছে ভাবীকাল তাতে যে অনিরাপদ হয়ে পড়বে এটা কবি বুঝতে পারলেন। আমেরিকায় দেখতে পেলেন ওই একই অবস্থা। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে সর্বমানবের আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্র সংস্থাপনের চিন্তা জাগে। লস এঞ্জেলেস থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কবি লিখছেন,

> ... তার পরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে– ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে– স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হযে আসছে– ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। এই জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে– সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬)

কাজটি মোটেও সহজ ছিল না কেননা সেটা ছিল 'একটা উজান-পথে চলা'। শান্তিনিকেতনের শুরুই হয়েছিল বালকদের মুক্তির স্বাদ, মনের দাসত্ব ঘোচানো ও 'কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে তোতাপাখি করে তোলার' পরিবর্তে স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখানোর প্রতিজ্ঞা করে। তারপর ধীরে ধীরে ব্রহ্মবিদ্যালয়টিকে বিদ্যার সাধকদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রের যথার্থ যোগ্য করতে প্রয়াসী হলেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের দিনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, 'এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।' সেদিন রবীন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে জানান বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করার সাধ্য না-থাকলেও সেজন্যে তারা হতাশ নন। বরং আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, 'সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৮)। এমন দৃঢ়তার কারণ ছিল যে, সূচনালগ্নেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এমনসব পণ্ডিতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, যা ছিল সত্যিকার অর্থেই যজ্ঞতুল্য। সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, সিংহলের মহাস্থবির, ক্ষিতিমোহন সেন; পাশ্চাত্য সাহিত্যের জন্য এন্ড্রুজ, সংগীতের জন্য ভীমশাস্ত্রী, দিনেন্দ্রনাথ ও নকুলেশ্বর গোস্বামী, বিহার থেকে ফারসি ও উর্দুর জনৈক অধ্যাপক এবং চিত্রকলার জন্য নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ নামজাদা পণ্ডিতবৃন্দ। এঁরা সকলেই ছিলেন সূচনাকালের বিশ্বভারতীর প্রাণভোমরা।

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথের সংকল্প ছিল শিক্ষার আয়তন দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখবেন, কিন্তু পরে তা বৃহৎপরিসরে মুক্তিলাভে সচেষ্ট হলো। কালে তাঁর মনে হলো যে, 'যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের, তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৩)। ১৯২০-২১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করেন। নানা কারণে সে-ভ্রমণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাতকুমার স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন যে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপ তার পুনর্গঠন কীভাবে করছে,

সেখানকার মনীষীরা জাগতিক সমস্যা বিষয়ে কী চিন্তা করছেন তা প্রত্যক্ষভঅবে জানবার ও বুঝবার জন্য এবারকার ইউরোপ যাত্রা (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৪)। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিমা বিশ্ব দেখে কবির মনে সভ্যতার প্রতি করুণাই জাগল। মানুষকে মনে হলো তাঁর বেদনাহত, আর তিনি দেখতে পেলেন মানুষ পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি ভেঙে পড়েছে। আজ মানুষের মনে হয়েছে, সে-আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমা মনীষীরাও তা উপলব্ধি করেছেন এবং অভাব পূর্ণ হবার মানুষের সাধনার পথসন্ধানও করছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, প্রাচ্য বিশ্বসভ্যতায় কী সম্পদ দিতে পারে তা জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সর্বত্র একটা বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে দেখা যায়। তখন রবীন্দ্রমনে প্রশ্ন জাগে,

> ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এই কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব? (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৪)

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে, 'বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের সম্পদ হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৪)। বিশ্বযুদ্ধ শেষে যে লিগ অব নেশনস্ গঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এতে যে খুব উৎফুল্ল হয়েছিলেন এমন নয়। তাঁর মনে হয়নি এতে জগতের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। রবীন্দ্রভাবনায় বরং ছিল শিক্ষার যোগে জ্ঞানের মিলনসাধনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আপন মানসিক ঐক্য উপলব্ধি করুক। তবেই মানুষের হিংস্রভাব দূর হয়ে চিরমিলনের পথে এগিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথে এরূপ মনোভাব ও উদ্‌যোগ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার লিখেছেন,

> য়ুরোপের মনীষীদের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন— সকলেই মহত্তর জীবনযাপনের আদর্শের সন্ধান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে কেবল ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র করিয়া রাখিবার কথা আর ভাবিতে পারিতেছেন না; তিনি তাহার প্রতিষ্ঠানকে বলিতেছেন International University। তাহার মনে হইতেছে য়ুরোপ হইতে জ্ঞানীদের আহ্বান করিয়া আনিবেন শান্তিনিকেতনে— পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন ঘটিবে এই সহযোগিতার উপর। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে কবির বহুদিনে ভাবনা এতকাল পরে মূর্ত হইতে লাগিল। (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ১৩৯)

রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক মনোভাব ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের জোরেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতীরূপে জয়যাত্রা করে। ব্রহ্মাশ্রমের অবসানে বিশ্বভারতীর উদ্ভব হয়েছে এমনটা নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ এর আবির্ভাব (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ৩৭)। বহুদিনের বহু সংকল্পে সে ভাবনাকে নিভৃতে পোষণ করে পলে পলে একে পরিণতি দিয়েছেন। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে আদর্শগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি; ব্রহ্মাচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী উভয়েরই আরাধ্য ছিল বৈদিককালের তপোবন কিংবা বৌদ্ধযুগের নালন্দার 'সত্যমানুষ'।

কিন্তু এই সত্যমানুষ তো সাধনার ফল। আর সে সাধনার পথ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বোধ শুধু রবীন্দ্র-উপলব্ধিতেই ছিল না; বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, আরবিন্দ ঘোষ প্রমুখেরও উপলব্ধ সত্য। উনিশ শতকের শেষভাগে এসে ভারতের সর্বত্রই শিক্ষিতদের মনে পাশ্চাত্যশিক্ষার ব্যাপারে প্রশ্ন ও দ্বিধা জাগে। শতবছরের মাথায় ভারতীয়রা

আবিষ্কার করল তারা ক্রমশই বলহীন হয়ে পড়ছে; তাই শুধু নয়, 'হিন্দুভারত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুরোপুরি পায় নাই, আবার ভারতের মৌলিক সাধনার সহিতও সে বিচ্ছিন্ন— আপনার আত্মাকেও সে হারাইতেছে' (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ৩২)। কলকাতার বিদ্যালয়সমূহে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা সুখকর ছিল না। তিনি স্কুল-পলাতক হয়েছিলেন। তার মনেও হয়েছিল এই পথে 'সত্যমানুষ' সৃষ্টি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় ভারতের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ তাই নিজ সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাননি, শিক্ষা সম্বন্ধে নিজ আদর্শে শিলাইদহে গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবং সে-বিদ্যালয়টি একদিন শিলাইদহের 'গৃহকোণের সীমানা হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে' অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে স্থাপন করলেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্ব লাভ— স্বার্থ নহে, পরমার্থ। ... ইহাই ব্রহ্মচর্যব্রত; এ কেবল পড়া মুখস্থ করা ও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া নহে। ইহা ধর্মব্রত।' পত্রটির শেষের দিকে এসে আরও লিখেন,

> আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্তসমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনাসহকারে তাহা দুর্লভধনের ন্যায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়। (রবীন্দ্রনাথ, উদ্ধৃত : প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ৪৩)

এর বাইরে বিদেশ থেকে ধার করে যে বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন তাতে অন্তত মনুষ্যত্বলাভের সম্ভাবনা ফুরিয়ে যায়। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে সকল দেশে সকল কালের মানবিক বিকাশ জড়িত। ভারত-প্রশ্নে, ভারতের শিক্ষার সঙ্গে এসবকে দূর বিচ্ছেদ করায় বৃহৎযাত্রায় হয়েছে গোড়ায় গলদ। তাই, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের শিক্ষা তাঁকে আনন্দদানের পরিবর্তে পীড়নই করেছে। সে ব্যবস্থা ক্লেশ দিত, আঘাত করত; এটাকে তার অন্যায় ও অন্যায্য মনে হতো; এমনকি বড়ো হয়েও সেটা তিনি ভুলতে পারেননি,

> কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠোন আর ইটের উঁচু দেওয়াল যেন আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশু প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত। ... প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৫)

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় বক্তৃতা করেছেন। সকলে মনে করল এটা ভাবের কথা, কবির বাণী। না এটা মানলেন কেউ, না কাজে খাটানোর উদ্যোগ নিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'অসাধ্যসাধনে' লেগে গেলেন, 'আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির

গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে– এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৬)।

ঘাড়ে লক্ষ টাকার দেনা নিয়েও বিশাল যজ্ঞে যাত্রা করলেন কবি-কর্মী। শান্তিনিকেতনের জামগাছতলায় পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়েই শুরু করলেন। নিজের বিদ্যার সামর্থ্য অনুযায়ী ছেলে কটিকে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়ে, হাসিয়ে কাঁদিয়ে, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মানুষ করলেন। প্রতিষ্ঠান আকারে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হলেও রবীন্দ্রনাথ জবরদস্তির বিরুদ্ধে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, সংকল্প ত্যাগ করেননি। তার অভিপ্রায় ছিল বিদ্যার্থীরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে এবং পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হবে। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগ, অভিনয়ে, গান এবং ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ চাইতেন, জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য শিশুরা বুঝতে শিখুক। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার কথা এই যে, সবচেয়ে বড়ো যে আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে।' এজন্যে সকাল-সন্ধ্যায় প্রাচীন তপোবনের মহৎ বাণী উচ্চারণ করিয়েছেন, নিশ্চুপ বসিয়ে রেখেছেন। দেখেছেন এতে তাদের মনের মধ্যে ঘটমান পরিবর্তনকে। এতে করে ছেলেদের মধ্যে একধরনের কলহাস্য, ব্যাকুল চঞ্চলতা ও অপার আনন্দ রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন। এই শিশুদের মধ্যেই তিনি স্পর্শ করলেন নিখিল মানুষ। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩০)। বিশ্বভারতী নিয়ে এলো আরও বৃহৎপরিসর। শুধু গ্রহণ নয়, ভারত বা প্রাচ্য অঙ্গীকার করল দেওয়ার যা আছে, তা দান করতে। ভারতের ক্ষেত্রে তাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

আধুনিক পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা নেই, মানুষ পরস্পরের কাছে এসেছে; রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ এ সত্য ভারতবাসীর অনুসরণীয়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব আছে, সংঘাত আছে, হিংসা আছে, বিচ্ছেদও আছে। কিন্তু এটা মানুষের সত্য নয়; মানবসত্য হচ্ছে মিলন। মানুষে মানুষে এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। এই সত্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের মতে, পূর্ব-পশ্চিম নেই। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। নেই বলে পৃথিবীর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কস্থাপনে বিশ্বাসী তিনি। পশ্চিমের দিকে একতরফা হাত পেতে রাখাতে আদান-প্রদানের সম্বন্ধও স্থাপিত হয়নি। ফলে ভারত-অন্তরে আত্মবিশ্বাসের অভাব, দীনতার ছড়াছড়ি। শুধু তাই নয়, এককালে যে-ভারতে গুরুকণ্ঠে 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা' আহ্বানবাণী ধ্বনিত হতো; সেখানে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন, ভারত 'সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে' আছে। এ বিচ্ছিন্নতা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজসাধ্য নয়। সুতরাং,

> সেবা করবার, সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটেফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালায় পড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩২)

এই প্রত্যয়েই বিশ্বভারতীকে সত্যসাধনা, সত্যসম্মিলন ও জ্ঞানের তীর্থ হিসেবে গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ বদ্ধপরিকর ছিলেন। এ জন্য তাঁর মনে হয়েছিল ভারতবর্ষকে– তার আপন মনকে জানতে হবে এবং আধুনিককালের সকল লাঞ্ছনা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। তিনি মনে করেছেন, যা কিছু ভারতের সম্পদ, যা কিছু ভারতের গৌরব– রামানানুজ, শংকরাচার্য, বুদ্ধদেব প্রমুখ ভারত-মনীষীগণ বিশ্বমানবের জন্য যা কিছু রেখে গেছেন তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম ছাড়াও প্রাচ্যের আপরাপর ধর্ম জরাস্তেরীয়, ইসলাম প্রভৃতির শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে ভারতের বিচিত্রসৃষ্টির পরিচয়ই যে ভারতের পূর্ণপরিচয় তা উপলব্ধির জন্য বিশ্বভারতীর মতো সাধনক্ষেত্র বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ছিল : 'বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। ... মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩৩)।

কিন্তু বিশ্বভারতীর ভাব ও আদর্শ শুরুর দিকে অনেকেই অনুধাবন করতে পারেননি। এ নিয়ে বরং রবীন্দ্রনাথের উচ্চবাচ্য তেমন ছিল না। কারণ, তাঁর মতে, 'আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩৫)। এ কথা অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই কুড়ি বছর আগে নিভৃতে-গোপনে তার কাজটি করে গেছেন। মাঝে মাঝে বাধা এলে বলেছেন, 'হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩৫–৩৬)। কিন্তু শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডে শিশু থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত সবাই যে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করে গেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের ছিল অটল বিশ্বাস 'আশা আছে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষরূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩৬)। আর বিদ্যালয়ের শিশুদের চোখে-মুখে যেদিন আনন্দের ছটা দেখতে পেলেন, স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেলেন সেদিন তিনি প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলেন। তাঁর গোপনটাও ছিল গরজ, আর প্রকাশ্যটাও আপনার থেকে আদেশ।

যুগচেতনা রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। তিনি জেনেছিলেন, সময়টা ইতিহাসের ক্রান্তিকাল। ইতিহাস নতুনদিকে বাঁক নেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের জন্য যেটা সত্য, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে– এটা কাজ করেছিল এতদিন ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে। জাতীয় উন্নতিই ছিল এতদিন জাতিবিশেষের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ভূগোলের সীমা ভেঙে গেল বলে দেশ বা জাতিগত বেড়াও ভেঙে গেল; মানুষ এসে দাঁড়াল পরস্পরের কাছে– কিন্তু ব্যবধান কমলো না। রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি, 'কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪০)। তিনি চিহ্নিত করলেন এটাকে পুরোনো যুগের অভ্যাস বলে; অথচ তা বর্তমান কালের পাথেয় নয়। বরং টিকে থাকতে হলে যুগের সত্যকেই ধারণ করতে হবে। কোথাও তা হচ্ছে না বলে, 'তাই আজ মারামারি বেধেছে, নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তাতেই বুঝেছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪০)।

এই সত্যসাধনার প্রধান বাধা জাতিবৈর ও ধনের গৌরব। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, ধন মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে, আর সত্য ভেদকে অতিক্রম করে। এ শিক্ষা ভারতীয়। ভারতীয় ঋষির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই তিনি উচ্চারণ করেছেন, ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে

না, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪১)। রবীন্দ্রনাথের মতে, বিশ্বভারতী সেই অধিকার স্বীকার করেছিল। তাই ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনা ও সত্যসাধনার যে তপস্যা করেছে অতীতে, সেটাকে বর্তমান যুগের ওপর প্রতিষ্ঠিত করাই বিশ্বভারতীর সাধনা।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসে রবীন্দ্রনাথ আপন খেয়ালে সাহিত্যরচনা করেছেন, সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটিয়েছেন। তারপর বৃহৎপৃথিবীর কর্মযজ্ঞের ডাক পান, অন্তরের আহ্বানে। যে-কর্ম করার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা হলো, তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। অথচ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল না। তাহলেও চারপাশ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালিতে গুরুতর একটা জিনিসের অভাব রয়েছে যা শিক্ষাকে জীবন থেকে স্বতন্ত্র রাখার পক্ষে যথেষ্ট। এই গুরুতর সমস্যা শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সকল দেশেরও : 'সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না– সর্বত্র বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪৮)। এই সীমাবদ্ধ আয়োজন তাঁর মগ্নচৈতন্যে আদর্শ ও সংকল্পের বীজ বপন করে, যা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে বৃহৎপৃথিবীতে জেগে ওঠে। তপোবনের শিক্ষাপ্রণালিতে রবীন্দ্রনাথ বড়ো একটা সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। যে বিশ্বপ্রকৃতির কোলে মানুষের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ বিদ্যমান। ফলে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, 'তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪৯)। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সাধনায় তাই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য মানুষের অন্তরে যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তা মেটাবার চেষ্টা করেছেন এবং যে-স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত তাকেও জাগাতে চেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মনের ধারা ঠিক করে দিয়ে দেওয়া ও একটি অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলাকে তিনি প্রয়োজন মনে করতেন,

> মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানব-বিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৫১-৫২)

এইসবের অভাবহেতু মানুষ তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারছে না, নিজেকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা দেশে কি বিদেশে মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখছে। ভারতীয়রা ঋষিদের বাণী ভুলেছে, যেখানে তারা বলেছেন 'ভূমৈব সুখম'– দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। অথচ জীবনকে না জানলে, জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা ও ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে না পারলে মনুষ্যত্ব অর্জন একেবারেই অসম্ভব।

দুঃখের অনুভূতিও প্রখর হয় না, হয় না আপনাকেও চেনা। শেষ বয়সে কবি লিখেছিলেন– 'আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন'; অথচ এই তপস্যা জীবন থেকে উধাও হয়ে গেছে। ঋষিদের বাণী স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে, সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করেন, তপস্যা করেই সবকিছু সৃজন করেছেন। জগতের সকল বস্তুতে সে তপস্যা নিহিত আছে। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলছে। মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তারও কাজ সৃষ্টি। মানুষ শুধু যে গ্রহণ করে, সঞ্চয় করে তা-ই নয়, সে ত্যাগও করে; আর এটাই তার সত্য পরিচয়। সুতরাং মানুষ যে তপস্বী– এটা তাকে উপলব্ধি করতে হবে : 'উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৫৩)। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সব দেশের সব জাতির মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে ভারতের মানুষকেও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছুতে হবে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে এ প্রত্যয়ই তাঁর মনে ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপকে পর্যবেক্ষণ ও বিচার করেছেন নানাভাবে। ইউরোপ থেকে পাওয়া সম্মাননা তাকে শিখিয়েছে যে, 'মানুষের অন্তরপ্রদেশের বেদনা-নিকেতনে' জাতিবিচার নেই। ইউরোপের গুণী মানুষেরা তাঁকে আত্মীয়রূপে বরণ করে নিয়ে প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে নিঃসংকোচে; একইভাবে ইউরোপ জগদীশ চন্দ্র বসুর সত্যজ্ঞানেও অভ্যর্থনা জানিয়েছে উদারচিত্তে। রবীন্দ্রনাথ আরও লক্ষ করেছেন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিক দুর্যোগ, রেষারেষি, যুদ্ধ ও প্রতিযোগিতা লেগে থাকলেও জ্ঞানতাত্ত্বিক সহযোগ কখনও বন্ধ হয়নি। এশিক্ষা রবীন্দ্রনাথকে তাড়িত করেছিল বলেই বিশ্বভারতীর সাধনার ক্ষেত্রে তিনি বরাবর পাশ্চাত্য মনীষীদের নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতী যেন এমন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে, যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়।

মানুষের ভেতরকার সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা নিজেকে বিকশিত করবার। ভারতীয় ঋষিবাক্য স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।' মানুষের এমন আকাঙ্ক্ষার পেছনে রবীন্দ্রনাথ কারণ নির্দেশ করেছেন যে, মানুষ নিজের মধ্যে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে এক দ্বান্দ্বিক সত্য। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেটিই চরম নয়। লোভ ও লোভকে চরিতার্থ করার বাসনার মধ্যে তার অন্তরে আরও এক গভীর চাওয়া কাজ করে। সে লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চায়। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, 'যে-পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৫৯-৬০)। মানবসত্যের প্রকাশ বাধাগ্রস্ত বলেই মানুষ সভ্যতা নির্মাণ করেছে বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। আর মানুষের নিজের প্রকাশ যে একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে এটাও জোর দিয়ে বলেছেন বারবার। তাঁর মতে, 'যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণে আচ্ছন্ন' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৬০)।

এই প্রকাশ হচ্ছে নিজেকে দান। মানুষ নিজেকে দিতে গিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে, নিজেকে জানে। নিজেকে দেওয়া ও নিজেকে জানা একসঙ্গে ঘটে বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ:'যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় ক'রে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই

অবরুদ্ধ; যে মানুষ নিজেকে দান ক'রে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৬১)। তাই আত্মনিবেদন পূর্ণ হলেই মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পায়, তা না হলে জগতের যত অনিষ্টকর ঘটনা। আত্মনিবেদনের মাধ্যমে সত্যরূপ গ্রহণ করে মানুষ বিশ্বের সঙ্গে মিলনের পথ পায়।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বিশ্বভারতীর ভেতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মনে করতেন বিদ্যার্থীরা যদি আশ্রমের ভেতরের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করতে সমর্থ হয়, আত্মনিবেদন আপনা থেকেই আসবে। সত্যে ধোঁয়াশা থাকলে ত্যাগে স্বতঃস্ফূর্ততা না-আসাই স্বাভাবিক। কেননা সত্য মানুষকে ত্যাগ করতে শেখায়। আবার ত্যাগের দ্বারাই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে এই ত্যাগেরই আহ্বান করেছিলেন।

কিন্তু এই ত্যাগ নিয়েও মানুষের বিভ্রান্তি ছিল দীর্ঘদিন ধরে। জাতিরাষ্ট্র উদ্ভবের পর থেকে পৃথিবীতে মানুষ স্বজাতির নামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়। ন্যাশনালিজম হয়ে উঠেছিল মনুষ্যত্বের বড়ো সত্য। এর অনিবার্য ফল ছিল লুণ্ঠন, শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বযুদ্ধ। ন্যাশনালিজমের সংকীর্ণ পরিচয় সত্যকে খণ্ডিত করেছিল বলে তা অশুভ পরিণতির পথ পায়। জাতিরাষ্ট্রের কারখানা ইউরোপ তাই জাতীয়তার বিভীষিকায় দগ্ধ হতে চললো,

> যুদ্ধ ও সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনরূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে; মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'— আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন করছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৬৪)

অথচ নতুন যুগ নিয়ে এসেছে নবজীবনের বার্তা। এই বার্তা মানবের আপন স্বরূপ উন্মোচনের। এই নবযুগের বাণীই রবীন্দ্রনাথের অন্তরের বাণী; বিশ্বভারতীতে এই বাণীরই বিঘোষক রবীন্দ্রনাথ। আশ্রমকে তাই তিনি সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব জ্ঞানসাধক নবজীবনের বার্তা নিয়ে বিশ্বভারতীতে হাজির হয়েছেন তাঁদের সম্মিলনই মানুষের সত্যরূপ প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস বলে মনে করেছেন। দেশে দেশে মানুষ জাতিভেদের মাধ্যমে যেভাবে মানবতাকে খণ্ডিত করেছে, সেখানে আত্মপরিচয়ে নিজেকেও কাটাছেঁড়া করেছে। এই 'ভেদবাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ'-এর বিপরীতে মানবতার শুশ্রূষায় ভারতকে তীর্থ হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথ, 'পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নতুন যুগকে দেখতে পাওয়া' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৬৫–৬৬)।

কিন্তু নতুন যুগের ভারতের অন্তরাত্মা কেমন? রবীন্দ্রনাথ একে পুরোনো আদিগঙ্গার দুর্গতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভারত একসময় সমস্ত পৃথিবীকে বড়ো সত্য তার উদার হস্তে দান করেছিল, বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিল বলে কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে বড়ো ক্ষেত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিল। চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সাধনার দ্বারা মনুষ্যত্বের তপস্যা করেছিল।

অথচ সে-ভারত আজ দরিদ্র, রিক্ত ও অপমানিত। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি ছিল, 'কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার অধিকারী' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৭৩–৭৪)। এই পূর্ণিমার আলো দেওয়ার মতো সম্পদ ভারতের আছে সুতরাং সারা পৃথিবীকে ভারত নিমন্ত্রণ করতে পারে। ধনে দরিদ্র বলে যদি সে সংকোচ বোধ করে তবে সেটা সর্বমানবেরই অপমান। রবীন্দ্রনাথের এই সংকোচ ছিল না। তিনি বুদ্ধদেবের মতো জানতেন, সত্য আপন মহিমাতেই গৌরবান্বিত।

পশ্চিমের অভিঘাতেই ভারতীয় মনে জাত্যাভিমান আসে। ফলে সে শিখেছে নেশন পরিচয় আগে, তারপরে সত্য। ভারতজীবনে জরা এসেছে এই পথ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দেখেছেন পশ্চিমে অর্থব্যবস্থা কীভাবে শিক্ষাদীক্ষাসত্যসাধনাকে নিঃশেষিত করছে। সুতরাং ভারতের পথ এ নয়; ভারতের আকাঙ্ক্ষাও তা নয় : 'বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্যসম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না-যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৭৫)। এই দায়িত্ব বিশ্বভারতী নিয়েও ছিল। দায়িত্বের সঙ্গে নিমন্ত্রণ জড়িত বলে রবীন্দ্রনাথ ঋষিবাণী ভুলেননি,— 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'— তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা শুনে যাও। সত্যের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বভারতী ঘোষণা করে। কেননা নীরব থাকা আর অস্তিত্বহীন হওয়া এককথা। তাই সত্যসাধনার বাণী ভারত ও বিশ্বের কাছে বিশ্বভারতী প্রচার করুক, বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সম্পদ উপলব্ধি করুক সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট থেকেছেন।

মুক্তির আদর্শ নিয়ে যে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হয়েছিল সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংকীর্ণ সংস্কার দূর হয়ে বন্দিদশা কতকটা ঘুচেওছিল। এখানে সব মানুষকে আপন বলে স্বীকার করা হয়েছিল; পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল; এর প্রধান কারণ ছিল প্রকৃতিতে ধাত্রী হিসেবে স্বীকার করা। কিন্তু মানুষের আরও একটা অস্বাভাবিকতা রবীন্দ্রনাথের মনোঃপীড়ার কারণ ছিল। সেটা হলো এই যে, মানুষই মানুষের প্রধান শত্রু হিসেবে অবতীর্ণ হওয়া। মানুষের সীমাহীন অজ্ঞতাই যে এর প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। জানতেন অজ্ঞতার খেসারত দিতে গিয়েই মানুষ অন্তর থেকে বিশ্বকে অস্বীকার করে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনছে। অথচ নানা সভ্যতার ধারায় পৃথিবীতে যেমন জ্ঞানের তীর্থ রচিত হয়েছে, তেমনি নানা জাতির সমাবেশে মানুষের মহামিলনও হয়েছে। গ্রিস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল তেমনি ভারতীয় সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। অন্যদিকে পৃথিবীর ইতিহাসে শুধু বর্বররাই অন্যকে অস্বীকার করে গ্রহণ না করে স্বতন্ত্র থেকেছে। সুতরাং শত্রুতার পরিবর্তে নতুন যুগে বিশ্বমানবকে আপন সত্তার অংশ বলে স্বীকার করার সময় এসেছে।

যে-ভারতবর্ষ দেহমনে নানা জাতের মানুষের মিলনে গড়া, যার সাধনা নানা জ্ঞান, নানা সভ্যতার সাধনা সে ভারত ইউরোপীয় নেশনের আদলে নিজেকে গড়ার যে মতলব আঁটছে তাতে রবীন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, এমনটা হওয়ার প্রধান কারণ ভারতবর্ষের মানুষ আপন ইতিহাস ভুলতে বসেছে। কেননা ইউরোপ আমেরিকার যার যার জাতীয়তার ভিত্তি আর ভারতের ভিত্তি এক নয়। ভারত-অন্তরের কথা হচ্ছে, 'যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন।' অর্থাৎ তিনি

অপ্রকাশ থাকেন না। তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনও বড়ো হতে পারল না। ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। ইতিহাস তা বলেও না। ইতিহাস হচ্ছে মানুষ যখনই বিশ্বে নিজের জ্ঞান ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮৩)।

প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে মুক্তি দেবেন। কিন্তু পরে যখন তার মনে হলো, মানুষে মানুষে বিরাট ব্যবধান ঘটে গেছে; এবং তা অপসারণ করা দরকার, তখন নব কর্মপন্থা যুক্ত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দেবার প্রতিজ্ঞা করলেন। সেই লক্ষে তিনি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলেন,

> কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের— নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য— 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণ-পরিচয় লাভ করেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮৩–৮৪)

এই উপলব্ধি নিয়েই বিশ্বভারতীকে বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা মোকাবেলায় আসীন হতে অকুণ্ঠ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের ঐশ্বর্যের প্রতি আস্থা এনে অকৃপণ হাতে বিশ্বমিলনক্ষেত্রে তা প্রচার করতে যদি আঘাত ও অপমানও আসে তাহলেও সেটাকে বরণ করতে আহ্বান করেন। 'পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রুপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮৫)। যে ভারতবর্ষ চিরকাল 'সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও', ও 'মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও' বলে প্রার্থনা করেছে, সে ভারতবর্ষ নিজেকে ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে রাজি নয় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

একটা স্বপ্নের ঘোরে আশ্রমবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ক্রমে তা বিশ্বভারতীতে রূপ নিয়েছিল। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্রশিক্ষক জড়ো হয়েছেন, দূরপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকেও এসেছেন জ্ঞানসাধকরা। পাশ্চাত্যের সিলভ্যা লেভি, উইন্টারনিট্জ, লেসনি প্রমুখ বিদ্বানরা এসেছেন, ভারতকে দিয়েছেন, ভারতে থেকে নিয়েছেন। বিশ্বভারতী নিজের অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই হীনম্মন্যতা কখনওই ছিল না ভারত পরাধীন বলে, ভারত দরিদ্র বলে তার সত্যসম্পদ বিশ্ব গ্রহণ করবে না। সর্বদাই তাঁর প্রতীতি ছিল যদি সাধনা সত্য হয়, অন্তরে বাণী থাকে তাহলে মাথা হেঁট করে সকলকে তা নিতেই হবে। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল, ভারত একটা সুগভীর ভাবলোকেই নিজের মতো ছিল। ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি যেখানে সারা পৃথিবীকে অস্থির করে তুলেছে, মানুষের পারস্পরিক শত্রুতা প্রাচীন পৃথিবীকেও হার মানিয়ে দিয়েছে; ভারতের ঘুম ভেঙেছে বরং সে

সংঘাত ও সংহারেই। মানুষের সীমাহীন বেদনা, দাসত্ব ও মনুষ্যত্বের খর্বতা নিরস্ত করতে ভারত-ঐশ্বর্যকেই সন্ধান করেছে।

বুদ্ধদেবের বাণী বিশ্বসমস্যা মোকাবেলায় রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিয়েছিল, আশ্বস্ত করেছিল। যে বুদ্ধ একদিন একটা ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব'; তাঁকেই আদর্শ হিসেবে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা হলো, বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯২)। বুদ্ধদেব চাননি ভারতবর্ষ শক্তিমত্ত হোক, ধনী হোক। তিনি তপস্যা করেছিলেন মানবসত্যের, দুঃখজয়ের। ভারত সে সাধনায় আবার জেগে উঠুক, সেই ধ্যানবিন্দু বিশ্বমানবে ছড়িয়ে দিক এটাই চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতী সে মন্ত্রপাঠের দায়িত্ব নিক।

গীতার বাণীও তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল– 'ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্যকে ভোলাব'। সর্বমানব সম্বন্ধে ভারতের সমকালীন দীনতা ভুলে গিয়ে বিশ্বভারতীর ক্ষেত্র ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার বিশ্ববাসীকে ভারততীর্থে আহ্বান করেছেন। কোনো বিশেষ শক্তিতে এই আহ্বান করেননি তিনি; না ব্যক্তিক, না সামষ্টিক। তাঁর মনে ভরসা ছিল মানুষের এই মুক্তির ডাক মানুষ শুনতে পাবেই, যতদূরেই সে থাক। কতটা সফল হবেন, নিশ্চিত যদিও ছিলেন না। তবে শুভবোধের ডাক তো নিরন্তর ছিলই : '...সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব সেই উৎসাহ আমাদের আসুক' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯৩)। রবীন্দ্রনাথ সে সাধনাকে তার একলার বলেননি, বলেছেন সকলের।

রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সর্বত্র শুধুই বন্ধনের রূপ, মুক্তির আদল কোথাও নেই। আর যে-বন্ধন একে জর্জরিত করে রেখেছে তা বাইরের নয়, ভেতরের। ভেদবিভেদের অসংখ্য শৃঙ্খলের চক্র ভারতকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও পীড়িত করে রেখেছে। আত্মীয়তার মধ্যে যে মানুষের মুক্তি এটা ভুলে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে তৈরি করেছে বিরোধ ও বেড়া। রবীন্দ্রনাথ পর্যবেক্ষণ যে,

> এক প্রদেশেরে সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে বাক্যকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পরসম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপরভেদবুদ্ধি কেবলই যখন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধগ্রস্ত। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯৫–৯৬)

অজ্ঞানতা ও স্বার্থবুদ্ধি এতটাই প্রকট যে রবীন্দ্রনাথ একে ভারতের 'অন্ধকার' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, এটাই ভারতের প্রধান দুর্বলতার কারণ। এই অন্ধকারই ভারতের বিভিন্ন সত্তাকে স্বতন্ত্র করে যোগাযোগহীন ও দূরবর্তী করেছে। ভারতেবর্ষে 'সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে' বলে রামমোহন রায় যেমন করে মুসলমানদের জানতেন কিংবা দারাশিকো হিন্দুদের বুঝেছিলেন; সেই বোঝাপড়া হিন্দু-মুসলমানে ততটা দেখতে পাননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করতেন, রামমোহন বা দারাশিকোর মতো পারস্পরিক বোঝাপড়াই হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ঘুচাতে পারে। শাস্ত্রীয় অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত বন্ধন বলে মনে করতেন। সুতরাং যারাই পরস্পরকে মানুষরূপে জানে তারাই তার জ্ঞাতি বলে ভারতের হিন্দু-

মুসলমান-শিখ প্রভৃতি পরস্পর সম্বন্ধে মহাজ্ঞাতি হলেই তবে তারা মহাজাতি হতে পারবে বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল।

এই পরস্পরের জানার সোপান ছিল বিশ্বভারতী। এই পরস্পরের মিলনের সাধনাই ছিল বিশ্বভারতী বিদ্যায়তনের সাধনা। বিধুশেখর শাস্ত্রী হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাইরে যেসব বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে আয়ত্ত করার যে ডাক দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এটা গভীরভাবে মনে ধরেছিল। সে আহ্বান মাথায় রেখেই, সে সত্যের প্রতি প্রতীতি রেখেই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি সসম্মান আতিথ্যই যথার্থ ভারতীয়। সুতরাং এর কৃপণতা মানেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী এ বিকৃতিকে পরিহার করে দেশের নানা জাতির পরিচয়ের ওপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে, সে সাধনার পীঠনির্মাণে এগিয়ে চলে, 'শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯৯)। শুধু তাই নয়, অসংখ্য অভাব, দৈন্য ও ব্যাঘাতের ভেতর দিয়ে দুর্গম পথ বেয়ে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যেখানে পৌঁছায়; তাতে তাঁর মনে হয়, এর সাধনা ভারত ভূ-সীমানায় বদ্ধ থাকতে পারে না। ভারতের যা আন্তর-সম্পদ তার দাবি সমগ্র বিশ্বের; জাত্যাভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে মুছে পৃথিবীর দাবি মোচন করার দায়িত্ব হয়ে পড়েছে বিশ্বভারতীর। 'যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১০২)।

এই বোধ ও প্রেরণা আরও শানিত হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের পর। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। প্রায় প্রতিদিন আগন্তুকেরা রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করতেন, পৃথিবীকে দেওয়ার মতো ভারতবর্ষের কী আছে? এটা রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ ভাবিয়েছিল, তিনি একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। দেখেছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনার মধ্যেই এদের জবাব লুকিয়ে আছে;

> ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায়— যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে— অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়— তাই তার সম্পদ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১০২)

মানবজাতির ইতিহাস চর্চা করে তিনি দেখেছিলেন প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপারে যেমন সৈন্যসামন্ত ও অর্থসামর্থ্য ইত্যাদিতে ভাগ চলে না; সে ভাগে তার ক্ষতি হয় কিন্তু ঐশ্বর্য ভাগে সে গর্বিত হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয়রা প্রভৃতি জাতি প্রভূত ধনের মালিক হলেও সভ্যতায় তাদের তেমন দান নেই; অন্যদিকে ইজিপ্ট, গ্রিস, রোম, প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ নানা ঐশ্বর্য দান করে বিশ্বকে ঋণী করে গৌরবের অধিকারী। সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল ভারতের হাতে শুধু ভিক্ষার ঝুলি নয়, বিশ্বযজ্ঞে দেওয়ার মতো তার অপার সম্পদ রয়েছে; এবং এই এই সম্পদের জন্য সে বিশ্বমানবকে আহ্বান করতে পারে। সুতরাং সকলের জন্য ভারতের বাণী তাই বিশ্বভারতী।

অপরদিকে সমগ্র পৃথিবীর ওপরে ইউরোপের আপন প্রভাব বিস্তারকে রবীন্দ্রনাথ আকস্মিক মনে করেননি; বিষয়টা তার কাছে বাহ্যও ছিল না। কেননা যে বর্বরতা প্রয়োজনের ওপর জোর দেয়,

রবীন্দ্রনাথের ধারণা ইউরোপ অনেক আগেই তা অতিক্রম করেছে। এমনকি ইউরোপ এমন এক সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্যের সন্ধান পেয়েছে যা সমস্ত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ও পরিপূর্ণ। ইউরোপীয় সেই পরশপাথরের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই ইউরোপকে একক ক্ষমতাশালী করেছে। 'এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণ য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে, তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে পারবে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১০৪)। মানবভ্যতায় ইউরোপের এই দানই তার গৌরব ও অমরতা উল্লেখ করেও রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ইউরোপ যেখানে নিজের লোভকে সমস্ত মানুষের চেয়ে বড়ো মনে করে, সেখানেই তার অভাব– সেখানেই তার খর্বতা ও বর্বরতা। এর কারণ ইউরোপের বিচ্ছিন্নতা, যা মানুষকে মানবসত্য থেকে দূরে রাখে। এই বিচ্ছিন্নতাকে রবীন্দ্রনাথ বরাবর পশুধর্ম বলে অভিহিতও করেছেন।

আবার পশ্চিমা দেশগুলো বিজ্ঞানের বাইরেও পলিটিক্স দ্বারা বিশ্বকে পর করে দিয়েছে বলে লক্ষ করেছেন। তাঁর অনুভূত হয়েছে যে, আত্মম্ভরি পলিটিক্সের দ্বারা ইউরোপের যেখানে আত্মবমননা, সেখানেই তার অন্ধকার। অর্থাৎ, ইউরোপ বিজ্ঞান দ্বারা নিজেকে সার্থক করছে, বিশ্বকে প্রকাশ করছে; অন্যদিকে সর্বভুক ক্ষুধার্ত পলিটিক্স নিজের বিনাশ ঘটাচ্ছে। 'কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো করে দেখে; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্তিত করে তোলে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১০৫)।

বিশ্বের ক্রমবর্ধমান এই ভয়াল বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণেরও পথ আছে বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে তার কাছে ইউরোপ অনুসরণযোগ্য নয়। যে ইউরোপ সীমাহীন অহমিকা দ্বারা, জাত্যাভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি-দ্বারা নিজে বড়ো হয়েছে; এটা বড়োত্ব নয়, এটা বড়োত্বের বাহ্যরূপ। বরং যে জ্ঞান, যে বিজ্ঞান তাকে মহৎ করেছে তাই তার সত্য; এই সত্যই মুক্তির পথ। এই পথের যৌথসারথি যা কিছু ভারত-ঐশ্বর্য। বিশ্বভারতীর কাজের ভেতর সে ঐশ্বর্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হেতু থাকুন, এটাই ছিল তার সাধনা।

জ্ঞান, ধর্ম ও সাধনা ছাড়াও ভারতের যে ঐশ্বর্য বিশ্বকে দেওয়ার মতো তা হচ্ছে ভারত-সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ তার সাধনযজ্ঞে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগ করেছিলেন। ইউরোপের সংস্কৃতি কেবল বিজ্ঞান নিয়ে ছিল না– সাহিত্য, সংগীত, নানা কলাবিদ্যা ও জনহিতকর কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে তার সংস্কৃতির জগৎ বিস্তৃত ছিল। এইসব সাংস্কৃতিক ধারা যে কেবল কর্মফল নিয়ে ছিল এমন নয়– তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের আত্মিক বিকাশ, মনুষ্যত্ব। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল নানাভাবে সে বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তাহলেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। 'মানুষের প্রকৃতিতে ঊর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্থন করতে পারে– আর কোনো কারণে নয়, তাতে তা আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৪৭)। কিন্তু বাস্তবে ভারতের অবস্থা ছিল ভিন্ন। যে-কটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, দেখা গেল সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালিতে ডিগ্রি দেওয়ার 'কারখানাঘর' বসেছে। এধরনের ডিগ্রিতে সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বাড়লেও সত্যের জন্য কর্মের

জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা পায়নি। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য মানবসত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে বরং এর প্রয়োজন ছিল। এই বাস্তব প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় করেছিলেন। 'আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ যে সীমা আছে, কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৪৮–৪৯)। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ পদ্মার বোট থেকে উঠে এসে কলকাতার অদূরের পল্লিতে কর্মী ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথে পরিণত হন।

উপসংহার

'বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজের জন্যে। নিজেকে দিয়ে ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৪৯)। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের একটা বক্তৃতায় নিজের দীর্ঘ সাধনার উন্মোচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এভাবে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরে শিক্ষব্রতী কবি এমনরূপ সাধনাকে আরও উল্লেখ করেছেন, 'এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্রে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫০)। এই অভিজ্ঞান শেষে পেয়েছিলেন তিনি যে, আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, 'সামান্য ছেলে পড়ানোর মধ্যেও'। মানুষের সামান্য প্রচেষ্টাও বৃথা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন আগে যখন খুব ক্ষীণ ও অতি তুচ্ছভাবে আয়োজন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের, সেদিন তিনি ভাবেননি তাঁর জীবৎকালেই বিশ্বভারতীরূপে এর বিস্তার ঘটবে। তবে, কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে; নানা জাতি, নানা বিদ্যা ও নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটবে এ সংকল্প তাঁর মনে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ সাধনা তাঁর একার ছিল না। এ সাধনায় ভারতের নানা স্থান থেকে যেমন সাধকরা এসেছেন, তেমনি এ কর্মযজ্ঞে যোগ দিয়েছেন বহুদূর থেকে আগত বিদেশি জ্ঞানতাপসেরাও। রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞচিত্তে তাই, ' এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নয়। সকল কর্মীর চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে পুষ্ট করেছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৩০)। যদিও তখন স্বদেশবাসীর সহযোগিতা পাননি রবীন্দ্রনাথ।

বহুদিনে ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে দেশের বেদিমূলে স্থাপন করার সাধনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই সাঙ্গ করে এনেছিলেন। একটা ব্যাপরে তিনি তুষ্ট ছিলেন যে ব্যক্তিবিশেষের আশ্রয়ে তা পূর্ণতার দিকে যায়নি, বরং সম্মিলিত উদ্যোগে আশ্রমকে জনসাধারণের সংকল্পের অন্তর্গত করে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত করেছেন। বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে শ্রেয়কে বরণ করেছেন, যেহেতু কর্মের সাধনাই তাঁর কাছে মনুষ্যত্বের সাধনা ছিল। এই সাধনা এমনটা সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা আছে' এবং তার সর্বত্রই ধ্বনিত হচ্ছে প্রাচীন আচার্যদের একটি আহ্বান, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'। তাই বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অভিভাষণে অতিথি মনীষীদের সামনে ঘোষণা দেন, 'আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে যে

আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫৩)। এও তিনি বলেন, যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এমনকি দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন তার কর্মসাধনার ক্ষেত্রটি পূর্ণতায় ভরে উঠবে বলে মনে করেছেন। আর যে তপস্যা চল্লিশ বছর ধরে করেছেন শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ক্ষেত্রে; সে আদর্শের সঞ্চার রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাশা করেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, অনাগত কালেও তিনি চেয়েছেন এর বিস্তার। যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্তমান নিয়ে সুখী ছিলেন না। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৭ শ্রাবণ) জীর্ণ শরীরে শান্তিনিকেতন মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ বাণী দেন তাতে তাঁর হতাশাই প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি মন্দ্রিত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছিনে। মনে হয় এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫৫–১৫৬)। রবীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞ মন এটা অনুধাবন করেছিল সবকিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করাই যেন এ যুগের স্পর্ধা। এর বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে উঠেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। আর মানবসভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রীকে উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করছে সমাজ ও রাষ্ট্র। তবু তার চির আশাবাদী মন নিবেদন করেছে তার কর্ম ও সাধনাকে, 'আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান করো না– একে স্বীকার করে নাও' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫৭)। এই বাক্যে যে শুধু অনুনয় ছিল তা নয়, ছিল মনুষ্যত্বের প্রতি দায় ও সুগভীর প্রেম। মনুষ্যত্বের সাধনার এই ক্ষেত্রকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের শেষ আশাবাদ মানুষেরই অপরিসীম সম্ভাবনার প্রতি, 'ইতিহাসের বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।'

সহায়কপঞ্জি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪০৭)। *শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৯)। *বিশ্বভারতী*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৭)। 'মনুষ্যত্ব'। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৭)। *মানুষের ধর্ম*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (দশম খণ্ড)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিকাগো থেকে ৩রা মার্চ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত পত্র। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লস এঞ্জেলেস থেকে ১১ অক্টাবর ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত পত্র। *চিঠিপত্র* ২। বিশ্বভারতী, কলকাতা।